২) 'চণ্ডীর নিকটে পশুগণের দুঃখ নিবেদন' এবং 'কালকেতুর ভোজন' অবলম্বনে হাস্যরস সৃষ্টিতে মুকুন্দরামের নৈপুণ্য প্রদর্শন কর।

→ সাহিত্যে বিশুদ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি বিশেষ প্রতিভাধর শিল্পী না হইলে সম্ভবপর নহে, কারন গভীর জীবনবোধ হইতে হাস্যরসের উদ্ভব। মধ্যযুগের কবিদের এই জীবনবোধের অবিশেষ অভাব ছিল। কিন্তু মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে এই হাস্যরস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁহার ~~শিল্পবো~~ শিল্পবোধ ও জীবনবোধ-সম্ভূত রসিকতা তাঁহার পূর্ববর্তীদের গ্রাম্য ভাঁড়ামো হইতে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধে কৌতুক হাস্যের মধ্যে নির্ণয় করতে গিয়ে অসংগতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিম্নে 'চণ্ডীর নিকটে পশুগণের দুঃখ নিবেদন' এবং কালকেতুর ভোজন' অংশ দুটি অবলম্বনে হাস্যরস সৃষ্টিতে মুকুন্দরামের নৈপুণ্য আলোচনা করা হল।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে বন্য পশুরাও মানবিক মহিমালাভ করেছে। পশুরা যে কাব্যে সামাজিক প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। 'চণ্ডীর নিকট পশুগণের দুঃখ নিবেদন' অংশে কৌতুক রস সুন্দরভাবে দানা বেঁধেছে। এই কৌতুকতা কবির কাণ্ডজ্ঞান থেকে উদ্ভূত। কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডের' নায়ক কালকেতুর নির্মম অত্যাচারে পশুদের অসহায়তা স্পষ্ট। পশুরাজ সিংহের দুর্দশার চিত্র পাই এইভাবে —

"কহে বীর মৃগরাজ কহিতে বাসয়ে লাজ
কালকেতু ভাঙ্গিল দর্শন।"

হাতির দুঃখ-নিবেদনেও হাস্যরসের স্পষ্ট পরিচয় পাই —

"ভূমে লোটাইয়া মাথা কহে গজ দুঃখকথা
দন্ত দুটি হইল বাধা-হেতু।"

P.T.O.

বানরের দুঃখের কথা শুনেও আমরা না হেসে পারি না। —

“কপি বলে শুন মা আমার মতেক ছা
সবারে খেদিল মহাবীর।”

পশুগণের এই দুঃখের কথায় আমাদের কৌতুকবোধ হয়, এই কৌতুকের শিকড় জীবনের গভীরে প্রোথিত। জীবন রসিক কবি মুকুন্দরাম আলোচ্য অংশটিতে জীবনের মর্মমূলে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে হাস্যরসকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কালকেতুর ভোজনপর্বকে উপলক্ষ করে কবির রসিকতা ব্যক্ত হয়েছে। কবি এই অংশে যে হাস্যরস ফুটিয়ে তুলেছেন তা অতুলনীয়, কবি এই অংশের হাস্যরসের সুন্দর রূপ দিয়েছেন —

“মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে॥
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ,
ছয় হাঁড়ি মুসুরী সুপ মিশ্যা তথি লাউ॥”

কালকেতুর এই ভোজন ব্যঞ্জনা পাঠককে হাসতে বাধ্য করে।

কবি ভোজনদৃশ্য প্রসঙ্গে আরও বলেছেন —

“শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিশাল।
ছোট গ্রাস তোলে যেন তেয়াটিয়া তাল॥”

অবশেষে আলোচ্য অংশ দুটির ভিত্তিতে বলা যায় যে — জীবনের লঘু ও গম্ভীর সর্বক্ষেত্রেই মুকুন্দরাম স্বতঃস্ফূর্ত রসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এর সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র হাস্যরস সৃষ্টির মধ্যেই বিষয়গুলি আবদ্ধ নয়, ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা মুকুন্দরামের মানসপ্রবণতাকে প্রবণবিশেষ-রূপে প্রকাশ করেছে। এই দিক থেকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কবিকুলের মধ্যে তিনি একক ও অসামান্য মহিমায় চিরকাল অধিষ্ঠিত থাকবেন।

হাস্যরস — ৩
10.1.17

১) হরিদত্তের বেটা হই জয়দত্তের নাতি,
হাটে লয়্যা বেচাইব বীরের ঘোড়া হাতি।।
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা,
পুনর্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা।।

— কার উক্তি? উক্তিটির মধ্য দিয়ে বক্তার চরিত্রে যে পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

→ উপরি উক্ত চরণগুলি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর "চন্ডীমঙ্গল" বা "অভয়া মঙ্গল" এর কাব্য থেকে গৃহীত. এই উক্তিটি গুজরাট রাজ্যের রাজা কালকেতুর রাজকর্মচারী ভাঁড়ু দত্তের।

প্রদত্ত চরণগুলিতে ভাঁড়ু দত্ত রাজা কালকেতুকে প্রতিশোধ স্পৃহায় বলেছে। ভাঁড়ু দত্ত তার কপট বুদ্ধি বলে কালকেতুর রাজ্যের একজন পদস্থ রাজকর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে। ([illegible]) [illegible]